بسم الله الرحمن الرحيم

যুক্তরাজ্যের (টিলফোর্ড, সারেস্থ) ইসলামাবাদের মুবারক মসজিদে প্রদত্ত সৈয়্যদনা আমীরুল মু'মিনীন হযরত মির্যা মসরূর আহমদ খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.)-এর ২০ মে, ২০২২ মোতাবেক ২০ হিজরত, ১৪০১ হিজরী শামসী'র জুমুআর খুতবা

তাশাহ্হুদ, তা'ঊয এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন:

হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা.)-এর যুগে ইয়ামামার যুদ্ধের বিবরণ চলছিল। ইয়ামামার যুদ্ধের বিবরণে লেখা আছে যে, ইয়ামামা ইয়েমেনের একটি প্রসিদ্ধ শহর। বর্তমানে এই অঞ্চলটি সৌদি আরবে অবস্থিত। ইয়ামামা অত্যন্ত সবুজ-শ্যামল ও ঊর্বর এলাকা ছিল। অতএব, ইয়ামামা সম্পর্কে লেখা আছে যে; ইয়ামামা সুন্দরতম শহরগুলোর মধ্যে একটি শহর ছিল আর এতে ধন-সম্পদ, গাছপালা ও খেজুর বাগান প্রচুর পরিমাণে ছিল। ইয়ামামায় বনু হানীফা বসবাস করত, যারা চরম যুদ্ধবাজ জাতি ছিল। এদের সম্পর্কে তফসীরে কুরতবী'তে আয়াত سَتُدْعَوْنَ إِلَىٰ قَوْمٍ أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ تُقَاتِلُونَهُمْ أَوْ يُسْلِمُونَ (সূরা আল্ ফাতাহ্ :১৭) অর্থাৎ, অচিরেই তোমাদেরকে একটি দুর্দান্ত যোদ্ধা জাতির প্রতি আহ্বান করা হবে, তোমরা তাদের সাথে যুদ্ধ করবে যতক্ষণ না তারা মুসলমান হয়ে যায়– এর তফসীরে লেখা রয়েছে যে; হাসান বলেন, যুদ্ধবাজ জাতি বলতে পারস্য ও রোমানদের বোঝায়। ইবনে জুবায়ের বলেন, এর দ্বারা হাওয়াযেন ও সাকীফের গোত্রগুলো বোঝায়। যুহরী ও মুকাতেল বলেন, এর দ্বারা বনু হানীফাকে বোঝায় যারা ইয়ামামা নিবাসী ও মুসায়লামার সঙ্গী ছিল। রাফে' বিন খাদীজ বলেন, আমরা উক্ত আয়াত পাঠ করতাম, কিন্তু আমরা জানতাম না যে, এই যুদ্ধবাজ জাতি কারা। এমনকি হযরত আবু বকর (রা.) যখন আমাদেরকে বনু হানীফার সাথে যুদ্ধের জন্য আহ্বান করেন তখন আমরা বুঝতে পারি যে, এর দ্বারা এই জাতিকে বুঝায়। মহানবী (সা.) যখন সপ্তম হিজরীর সূচনায় অথবা কারো কারো মতে ষষ্ঠ হিজরীতে বিভিন্ন দেশের রাজা-বাদশাহ্র (কাছে) তবলীগি পত্র লিখেন, তখন ইয়ামামার বাদশাহ্ হওযা বিন আলী এবং ইয়ামামাবাসীদের উদ্দেশ্যেও একটি পত্র লিখেন, যাতে তাকে এবং ইয়ামামাবাসীদের ইসলামের প্রতি আহ্বান করেন। নবম হিজরী সনে যখন বিভিন্ন প্রতিনিধিদল মদিনায় আসে তখন ইয়ামামা থেকে বনু হানীফার প্রতিনিধিদলও আসে। এ প্রতিনিধিদলে মুজাআ' বিন মুরারাও ছিল যাকে তার অনুরোধের প্রেক্ষিতে মহানবী (সা.) একটি অনাবাদী জমি জায়গীর হিসেবে দান করেছিলেন। এই প্রতিনিধিদলে রাজ্জাল বিন উনফাওয়াও ছিল। এছাড়া মুসায়লামা কায্যাব ও সুমামা বিন কবীর বিন হাবীবও ছিল। ইবনে হিশামের মতে তার নাম ছিল মুসায়লামা বিন সুমামা, তার ডাকনাম ছিল আবু সুমামা। বনু হানীফার এই প্রতিনিধিদল মদিনায় এক আনসারী মহিলা রামলা বিনতে হারেস এর বাড়িতে অবস্থান করে। যখন মহানবী (সা.)-এর হাতে বয়আ'ত করার জন্য ক্রমাগতভাবে প্রতিনিধিদল আসতে থাকে তখন মহানবী (সা.) মদিনায় একটি বাড়ি নির্ধারণ করেন যেখানে তারা অবস্থান করত। এই বাড়িটি ছিল রামলা বিনতে হারেসের, যিনি বনু নাজ্জারের একজন মহিলা ছিলেন। এটি অনেক বড় একটি বাড়ি ছিল। বনু হানীফার এই প্রতিনিধিদল যখন মহানবী (সা.)-এর সাথে সাক্ষাতের জন্য যায় তখন তারা মুসায়লামাকে নিজেদের সাথে নিয়ে যায় নি। তাকে তারা

নিজেদের জিনিসপত্রের নিরাপত্তার জন্য পেছনে রেখে যায়। ইসলাম গ্রহণ করার পর মুসায়লামার ব্যাপারে তারা মহানবী (সা.)-কে বলে যে, হে আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)! আমরা আমাদের এক সঙ্গীকে আমাদের মালপত্র ও বাহনের কাছে রেখে এসেছি। সে আমাদের জন্য আমাদের মালপত্র পাহারা দিচ্ছে। তখন মহানবী (সা.) মুসায়লামার জন্যও সেই পরিমাণ উপহার প্রদানের নির্দেশ দেন যা অন্যদের দেওয়ার জন্য বলেছিলেন। তিনি আরও বলেন, সে মর্যাদায় তোমাদের চেয়ে তুচ্ছ নয়, কেননা সে তার সঙ্গীদের মালপত্রের নিরাপত্তা বিধান করছে। এরপর এই প্রতিনিধিদল মহানবী (সা.)-এর কাছ থেকে চলে যায় আর তিনি (সা.) মুসায়লামাকে যা দিয়েছিলেন তা-ও (সঙ্গে করে) নিয়ে যায়।

বর্ণিত এই রেওয়ায়েত থেকে বুঝা যায়, মুসায়লামা ছাড়া বনু হানীফার প্রতিনিধিদলের সকল সদস্যের সাথে মহানবী (সা.)-এর সাক্ষাৎ হয়েছিল। কিন্তু কোন কোন এমন রেওয়ায়েতও পাওয়া যায় যাতে মহানবী (সা.)-এর সাথে মুসায়লামার সাক্ষাতের উল্লেখ রয়েছে। সাধারণত এ সম্পর্কিত রেওয়ায়েতই রয়েছে যে, মুসায়লামা সাক্ষাৎ করেছিল। এ সম্পর্কে এটিও বলা হয় যে, সম্ভবত সে যখন দ্বিতীয়বার এসেছিল তখন সাক্ষাৎ করেছিল। যাহোক, এর বিশদ বিবরণে আরও লেখা আছে যে, এই প্রতিনিধিদল যখন মহানবী (সা.)-এর সমীপে উপস্থিত হয় তখন মুসায়লামাও তাদের মাঝে ছিল, (যা অন্যত্র লেখা আছে)। তারা মুসায়লামাকে মহানবী (সা.)-এর সমীপে কাপড়ে আবৃত অবস্থায় নিয়ে আসে। মহানবী (সা.) সাহাবীদের মাঝে উপস্থিত ছিলেন আর তাঁর হাতে খেজুরের একটি শাখা ছিল। মুসায়লামা তাঁর সাথে আলোচনা করে আর কিছু দাবিদাওয়া উপস্থাপন করে। তিনি (সা.) বলেন, তুমি যদি আমার কাছে আমার হাতে থাকা এই খেজুরের শাখাও চাও তাহলে তা-ও আমি তোমাকে দিব না। সহীহ্ বুখারীতে সংকলিত বিভিন্ন রেওয়ায়েত থেকে বুঝা যায় যে, মুসায়লামা মহানবী (সা.)-এর সাথে সাক্ষাতের জন্য যায়নি; বরং মহানবী (সা.) স্বয়ং তার কাছে গিয়েছিলেন। অতএব উবায়দুল্লাহ্ বিন আবদুল্লাহ্ বিন উতবা বর্ণনা করেন, আমরা সংবাদ পাই যে, মুসায়লামা কায্‌যাব মদিনায় এসেছে এবং হারেসের মেয়ের বাড়িতে অবস্থান নিয়েছে। হারেস বিন কুরাইযের মেয়ে তার স্ত্রী ছিল আর সে ছিল আবদুল্লাহ্ বিন আমেরের মাতা। মহানবী (সা.) তার কাছে আসেন। মহানবী (সা.)-এর সাথে হযরত সাবেত বিন কায়েস বিন শিমাস (রা.) ছিলেন আর তাকে মহানবী (সা.)-এর খতীব বা লেখক বলা হতো। মহানবী (সা.)-এর হাতে ছিল একটি লাঠি। তিনি (সা.) মুসায়লামার পাশে দাঁড়ান এবং তার সাথে কথা বলেন। মুসায়লামা তাঁকে (সা.) বলে, আপনি যদি চান তাহলে আমাদের এই বিষয়ের মাঝে আমাদেরকে ছেড়ে দিন। এরপর আপনি আপনার (তিরোধানের) পর এটিকে আমার জন্য নির্ধারণ করে দিন। অর্থাৎ, নবুওয়্যতের বিষয়ের সিদ্ধান্ত, আপনার পর যেন আমি লাভ করি। এটিই তার সবচেয়ে বড় দাবি ছিল। (উত্তরে) মহানবী (সা.) বলেন, যদি তুমি আমার কাছে এই লাঠিটিও চাও তাহলে আমি তোমাকে তা দিব না। আর আমি তোমাকে সেই ব্যক্তিই মনে করি যার সম্পর্কে আমাকে স্বপ্ন দেখানো হয়েছে, যা আমাকে দেখানো হয়েছে। আর এ হলো, সাবেত বিন কায়েস; তিনি আমার পক্ষ থেকে তোমাকে উত্তর দিবেন। এরপর মহানবী (সা.) ফিরে যান।

অনুরূপভাবে অন্য এক রেওয়ায়েতে উল্লেখ রয়েছে যে, হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বর্ণনা করেন, মহানবী (সা.)-এর যুগে মুসায়লামা কাযযাব আসে আর বলে, যদি মুহাম্মদ (সা.) তাঁর পরে আমাকে (তাঁর) স্থলাভিষিক্ত নিযুক্ত করেন তাহলে আমি তাঁর অনুসরণ করব।

এর মাধ্যমে প্রথম রেওয়ায়েতটি আরও স্পষ্ট হয়। আর সে সেখানে নিজ গোত্রের অনেক মানুষের সাথে এসেছিল। মহানবী (সা.) তার কাছে আসেন আর তাঁর (সা.) সাথে হযরত কায়েস বিন সাবেত বিন শিমাস ছিলেন। মহানবী (সা.)-এর হাতে খেজুর গাছের একটি লাঠি ছিল। এমনকি তিনি (সা.) এসে মুসায়লামার সামনে দাঁড়ান যখন সে তার সঙ্গীদের মাঝে ছিল। তিনি (সা.) বলেন, তুমি যদি আমার কাছে এই লাঠিটিও চাও তাহলে আমি এটিও তোমাকে দিব না। আর তুমি কখনো নিজের বিষয়ে আল্লাহ্‌র সিদ্ধান্ত লঙ্ঘন করতে পারবে না। তুমি যদি পৃষ্ঠ প্রদর্শন কর তাহলে আল্লাহ্ তোমার মূল কর্তন করে দিবেন। আর আমি দেখছি যে, তুমি সেই ব্যক্তি যার সম্পর্কে আমাকে স্বপ্নে অনেক কিছু দেখানো হয়েছে। আর ইনি হলেন, সাবেত বিন কায়েস; যিনি আমার পক্ষ থেকে তোমাকে উত্তর দিবেন। এরপর তিনি (সা.) তাকে ছেড়ে ফিরে যান। এটিও বুখারীর রেওয়ায়েত।

হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বর্ণনা করেন, আমি মহানবী (সা.)-এর এই কথা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেছিলাম যে, আমার মনে হচ্ছে তুমি সেই ব্যক্তি যার সম্পর্কে আমাকে স্বপ্নে সেসব কিছু দেখানো হয়েছে যা দেখানো হয়েছে। হযরত আবু হুরায়রা (রা.) আমাকে বলেন, মহানবী (সা.) বলেছেন, একবার আমি ঘুমন্ত ছিলাম, এমন সময় আমি আমার হাতে দুটি স্বর্ণের কঙ্কণ দেখতে পাই। (এখানে স্বপ্নের উল্লেখ হচ্ছে।) এগুলোর অবস্থা আমাকে চিন্তায় ফেলে দেয়। [মহানবী (সা.) বলেন, হাতে কঙ্কণ দেখেছি, এ অবস্থা আমাকে চিন্তায় ফেলে দেয়।] এরপর আমাকে স্বপ্নের মাঝেই ওহী করা হয় যেন আমি এগুলোতে ফুঁ দেই। অতএব আমি সেগুলোতে ফুঁ দিলে সেগুলো উধাও হয়ে যায়। আমি এর ব্যাখ্যা হিসেবে দু'জন মিথ্যাবাদী ব্যক্তিকে মনে করি যারা আমার পরে আত্মপ্রকাশ করবে। বর্ণনাকারী উবায়দুল্লাহ্ বলেন, এদের একজন হলো সেই আন্‌সী যাকে ফিরোয ইয়েমেনে হত্যা করেছে আর দ্বিতীয়জন হলো মুসায়লামা কায্‌যাব। এটিও বুখারী শরীফের রেওয়ায়েত।

যাহোক, উপরোক্ত রেওয়ায়েতগুলো থেকে এটিই মনে হয় যে, মুসায়লামা কায্‌যাব একাধিকবার মদিনায় এসেছিল। একবার সেই সময় যখন তার দলের লোকেরা তাকে জিনিসপত্রের দেখাশোনার জন্য পিছনে রেখে গিয়েছিল, আর মহানবী (সা.)-এর সাথে তার সাক্ষাৎ হয় নি। আর দ্বিতীয়বার সে তখন মদিনায় এসেছিল যখন তার সাক্ষাৎ মহানবী (সা.)-এর সাথে হয়েছিল আর যাতে সে মহানবী (সা.)-এর কাছে স্থলাভিষিক্ত হওয়ার দাবি করেছিল। এ প্রসঙ্গে সহীহ্ বুখারীর ভাষ্যগ্রন্থ ফাত্‌হুল বারী পুস্তকে লিখা আছে, সম্ভবত মুসায়লামা দু'বার মদিনায় এসে থাকবে। প্রথবার সেই সময় যখন বনু হানীফার নেতা তার পরিবর্তে অন্য কেউ ছিল (অর্থাৎ, তখন সে নিজ গোত্রের নেতা ছিল না, বরং) অন্য কেউ ছিল আর সে তার অধীনস্থ ছিল। এজন্যই তাকে জিনিসপত্রের দেখাশোনার জন্য পিছনে রাখা হয়েছিল। আর দ্বিতীয়বার সে তখন আসে যখন লোকেরা তার অধীনস্থ ছিল আর তখনই মহানবী (সা.)-এর সাথে তার কথা হয়েছিল। অথবা এটিও হতে পারে যে, ঘটনা একটি-ই ছিল আর সে স্বেচ্ছায় তার আত্মসম্ভ্রমবোধ এবং এ বিষয়ে দাম্ভিকতা প্রদর্শন করে মহানবী (সা.)-এর বৈঠকে উপস্থিত হওয়ার পরিবর্তে জিনিসপত্রের কাছে থেকে যায়। কিন্তু মহানবী (সা.) (মানুষের) মনস্তুষ্টির স্বভাবের কারণে তার সাথে সম্মানপূর্ণ আচরণ করেন। এছাড়া হাদীসে এটিও উল্লেখ রয়েছে যে, সে এক বড় দলের সাথে এসেছিল। বলা হয়ে থাকে যে, সে সতেরোজন লোকের সাথে এসেছিল। এ বিষয়টিও মুসায়লামার একাধিকবার মদিনায় আসার প্রমাণ বহন করে।

যাহোক, এ দলটি ইয়ামামায় ফিরে যাওয়ার পর আল্লাহ্‌র শত্রু মুসায়লামা মুরতাদ হয়ে যায় এবং নবী হওয়ার দাবি করে বসে। আর বলে, মহানবী (সা.)-এর সাথে আমাকেও নবুয়্যতের অংশীদার বানানো হয়েছে। তোমরা যখন মহানবী (সা.)-এর সমীপে আমার কথা উল্লেখ করেছিলে তখন কি তিনি একথা বলেন নি যে, সম্মান ও মর্যাদার দিক থেকে সে তোমাদের চেয়ে তুচ্ছ নয়। মহানবী (সা.) একথা কেবল এজন্য বলেছিলেন কেননা তিনি জানতেন যে, তিনি (সা.) নবী আর আমাকেও তাঁর বিষয়ে অংশীদার করা হয়েছে। এরপর মুসায়লামা মনগড়া বাণী রচনা করতে থাকে এবং মানুষের জন্য পবিত্র কুরআনের নকল করে বাণী রচনা করতে থাকে আর তাদের জন্য নামায মাফ করে দেয়। সে নিজস্ব শরীয়ত চালু করে আর নামায মাফ করে দেয়। একটি রেওয়ায়েত অনুসারে সে দুই বেলার নামায তথা এশা ও ফজরের নামায মাফ করে দিয়েছিল এবং মানুষের জন্য মদ্যপান ও ব্যভিচারকে বৈধ ঘোষণা করেছিল। একইসাথে সে এ সাক্ষ্যও দিত যে, মহানবী (সা.) নবী। ফলে বনু হানীফা এসব বিষয়ে তার সাথে একমত পোষণ করে। মুসায়লামার শক্তি বৃদ্ধির আরেকটি কারণ ছিল রাজ্জাল বিন উনফাওয়ার তার সাথে যুক্ত হওয়া। অত্যন্ত চতুরতার সাথে প্রথমত সে শরীয়তের মধ্যে সুযোগ-সুবিধা সৃষ্টি করে দিয়ে বলে যে, শরীয়তে এই এই সুযোগ-সুবিধা রয়েছে আর আল্লাহ্ তা'লা আমার প্রতিও ওহী অবতীর্ণ করেছেন। আর একই সাথে সে একথাও স্বীকার করত যে, মহানবী (সা.) নবী, যেন যারা মুসলমান হয়ে গিয়েছিল তাদের মাঝে এমন কোন ধারণা সৃষ্টি না হয় যে, সে আমাদেরকে মহানবী (সা.)-এর কাছ থেকে দূরে সরিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। অত্যন্ত কপটতার সাথে সে এসব কাজ করেছে। যাহোক, তিনি লিখেন, মুসায়লামার শক্তি বৃদ্ধির আরেকটি কারণ ছিল রাজ্জাল বিন উনফাওয়ার তার সাথে যুক্ত হওয়া। এ ব্যক্তিও ইয়ামামার-ই অধিবাসী ছিল এবং বনু হানীফার প্রতিনিধি দলের সাথেও এসেছিল। সে হিজরত করে মদিনায় মহানবী (সা.)-এর কাছে চলে এসেছিল। এখানে সে পবিত্র কুরআন পাঠ করে এবং ধর্মীয় জ্ঞান অর্জন করে। মুসায়লামা যখন মুরতাদ হয়ে যায় তখন মহানবী (সা.) তাকে ইয়ামামাবাসীদের কাছে শিক্ষকরূপে প্রেরণ করেন এবং মানুষকে মুসায়লামার আনুগত্য করা থেকে বিরত রাখতে পাঠান। কিন্তু সে মুসায়লামার চাইতে বড় ফিতনার কারণ হয়। সে যখন দেখে যে, মানুষ মুসায়লামার আনুগত্য গ্রহণ করে চলেছে তখন সে ঐসব লোকের দৃষ্টিতে নিজেকে সম্মানিত করার উদ্দেশ্যে তাদের সাথে যুক্ত হয়ে যায়। তাকে পাঠানো হয়েছিল সেখানকার লোকদের সংশোধনের জন্য এবং নৈরাজ্য দূরীকরণের জন্য, কিন্তু সে মুসায়লামার সাথে যোগ দেয়। উপরন্তু সে মুসায়লামার মিথ্যা নবুয়্যতের স্বীকৃতি দেয়ার পাশাপাশি রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর প্রতি একটি মিথ্যা বক্তব্যও আরোপ করে যে, মুসায়লামাকে রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর সাথে নবুয়্যতের অংশীদার করা হয়েছে– একথাও সে প্রচার করে। যেহেতু সে কুরআন করীমের জ্ঞান অর্জন করেছিল তাই লোকেরা তার কথায় বিশ্বাস করে। ইয়ামামাবাসীরা যখন দেখে যে, এমন এক ব্যক্তি মুসায়লামার নবুয়্যতের সাক্ষ্য দিচ্ছে যে রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর সঙ্গীদের একজন এবং সে মানুষকে কুরআন করীমের শিক্ষা দেয় তখন তাদের জন্য মুসায়লামার নবুয়্যত অস্বীকার করার আর কোন অবকাশ রইল না। ফলে মানুষ দলে দলে মুসায়লামার কাছে এসে তার বয়আত করতে আরম্ভ করে। মুসায়লামা রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর সমীপে একটি পত্রও লিখে যার মূল বিষয় ছিল এরূপ যে, আল্লাহ্‌র রসূল মুসায়লামার পক্ষ থেকে মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর প্রতি। পরসমাচার, অর্ধেক জমি আমাদের এবং অর্ধেক কুরাইশদের। কিন্তু কুরাইশরা ন্যায়বিচার করে না।

এর উত্তরে রসূলুল্লাহ্ (সা.) তাকে পত্র লিখেন যে, বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম। (আল্লাহ্‌র) নবী মুহাম্মদ (সা.)-এর পক্ষ থেকে মুসায়লামা কায্‌যাবের প্রতি। পরসমাচার, নিশ্চয় (সব) জমি আল্লাহ্‌রই। তিনি স্বীয় বান্দাদের মধ্যে থেকে যাকে চাইবেন এর উত্তরাধিকারী বানাবেন এবং শুভ পরিণাম মুত্তাকীদের জন্যই নির্ধারিত। তার প্রতি শান্তি বর্ষিত হোক যে হিদায়াতের অনুসরণ করে। একটি রেওয়ায়েতে উল্লেখ রয়েছে যে, হযরত হাবীব বিন যায়েদ আনসারী (রা.) মহানবী (সা.)-এর পত্র নিয়ে মুসায়লামার কাছে গিয়েছিলেন। তিনি যখন উক্ত পত্র মুসায়লামার কাছে দেন তখন সে বলে, তুমি কি এ বিষয়ে সাক্ষ্য দাও যে, মুহাম্মদ আল্লাহ্‌র রসূল? তিনি (রা.) বলেন, হ্যাঁ। এরপর সে বলে, তুমি কি এ সাক্ষ্য দাও যে, আমি আল্লাহ্‌র রসূল? তখন তিনি (রা.) বলেন, আমি বধির, শুনতে পাই না। অর্থাৎ, তিনি কথা ঘুরিয়ে দেন। মুসায়লামা বার বার এ প্রশ্নেরই পুনরাবৃত্তি করতে থাকে আর তিনিও একই উত্তর দিতে থাকেন। আর প্রতিবারই হযরত হাবীব (রা.) যখন তার প্রত্যাশা অনুযায়ী উত্তর না দিতেন (সে চাচ্ছিল তিনি যেন তাকেও নবী বলে স্বীকার করেন), যখন তার প্রত্যাশা অনুযায়ী উত্তর না পেত তখন সে উনার কোন একটি অঙ্গ কেটে ফেলত। (নির্যাতন করার উদ্দেশ্যে কোন না কোন অঙ্গ কেটে ফেলত যে, এখন ইতিবাচক উত্তর দাও।) কিন্তু হযরত হাবীব (রা.) ধৈর্য ও অবিচলতায় পাহাড়ের ন্যায় অনড় থাকেন। এভাবে সে তাকে টুকরো টুকরো করে ফেলে আর তার সামনেই হযরত হাবীব (রা.) শাহাদতের পেয়ালা পান করেন। মুসায়লামা ইয়ামামাতে বিদ্রোহের আগুন প্রজ্জ্বলিত করে। এখন এটি শুধু নবুয়্যতের দাবি নয়, বরং নিপীড়ন ও নির্যাতনও বটে, যেভাবে সে তাকে নবী মানতে অস্বীকারকারীদের সাথে আচরণ করেছে। মুসায়লামা ইয়ামামাতে বিদ্রোহের আগুন প্রজ্জ্বলিত করে এবং ইয়ামামা থেকে রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর গভর্ণর হযরত সুমামা বিন উসাল (রা.)-কে বের করে দেয়। মহানবী (সা.)-এর মৃত্যুর পর হযরত আবু বকর (রা.) যখন মুরতাদদের উদ্দেশ্যে বিভিন্ন সেনাদল প্রেরণ করেন তখন হযরত ইকরামা (রা.)-এর নেতৃত্বে মুসায়লামার উদ্দেশ্যেও তিনি একটি সেনাদল প্রেরণ করেন এবং তাকে সাহায্য করার জন্য তার পিছনে হযরত শারাহ্‌বীল বিন হাসানা (রা.)কে প্রেরণ করেন। হযরত আবু বকর (রা.) হযরত ইকরামা (রা.)-কে এই নির্দেশনা প্রদান করেন যে, শারাহ্‌বীল পৌঁছার পূর্বে মুসায়লামার সাথে যুদ্ধ বাঁধিয়ে দিয়ো না। কিন্তু হযরত ইকরামা ত্বরাপরায়ণতার পরিচয় দেন এবং হযরত শারাহ্‌বীল পৌঁছার পূর্বেই ইয়ামামাবাসীর ওপর আক্রমণ করে বসেন যেন বিজয়মুকুট তার মাথায় শোভা পায়, কিন্তু তিনি বিপদে পরিবেষ্টিত হন এবং পরাজয়ের সম্মুখীন হতে হয়। মুসায়লামার বাহিনী অনেক বড় ছিল। হযরত শারাহ্‌বীল যখন উক্ত ঘটনা জানতে পারেন তখন তিনি পথিমধ্যেই থেমে যান। হযরত ইকরামা (রা.) হযরত আবু বকর (রা.)-কে উক্ত ঘটনা সম্পর্কে বিস্তারিত লিখে পাঠান তখন হযরত আবু বকর (রা.) উত্তরে তাকে লিখেন, আমি তোমার চেহারাও দেখব না আর তুমিও আমাকে দেখবে না, আমি যে নির্দেশনা দিয়েছিলাম তুমি তা অমান্য করেছ। তুমি এখানে ফিরে এসো না, কেননা এতে মানুষের মাঝে কাপুরুষতা সৃষ্টি হতে পারে। তুমি হুযায়ফা ও আরফাজার কাছে চলে যাও এবং তাদের সাথে সম্মিলিতভাবে ওমান ও মাহরাবাসীদের সাথে যুদ্ধ কর। মাহরা আরবের দক্ষিণে ভারত মহাসাগরের পূর্ব উপকূলে অবস্থিত একটি অঞ্চলের নাম। তিনি আরও বলেন, এরপর তুমি তোমার বাহিনী নিয়ে ইয়েমেন ও হাযার মওতে চলে যেও। সেখানে গিয়ে ইসলামী সেনাবাহিনীর সাথে যোগ

দিবে। হাযার মওতও ইয়েমেনের পূর্বে অবস্থিত একটি রাজ্য, যার দক্ষিণ সীমান্ত সমুদ্রদ্বারা বেষ্টিত।

অপর এক রেওয়ায়েতে হযরত আবু বকর (রা.)-এর পত্রের যে বাক্যাবলী পাওয়া যায় তাহলো, নেতৃত্ব দিতে জান না আবার শিষ্যত্ব গ্রহণেও অনিচ্ছুক। এতটুকুও তুমি ভালোভাবে জান না। যুদ্ধের যেসব কৌশল ও পন্থা থাকে সেক্ষেত্রে যতটুকু সুদক্ষ হওয়া উচিত ততটুকু তুমি নও আর শিখতেও তোমার অনীহা। তুমি যেদিন আমার সাথে সাক্ষাৎ করবে সেদিন দেখবে আমি তোমার সাথে কী ব্যবহার করি। তুমি শুরাহ্‌বীলের আগমন পর্যন্ত কেন অপেক্ষা করে তার সহযোগিতা ও পারস্পরিক সাহায্যের মাধ্যমে যুদ্ধ কর নি। এখন হুযায়ফার কাছে যাও এবং তাকে সাহায্য কর। তুমি যুগখলীফার নির্দেশ অমান্য করেছ এবং নিজেকে বড় উস্তাদ মনে কর আর শিখতে চাও না। এখন নির্দেশনা এটাই যে, তুমি আমার কাছে আসবে না। তোমার সাথে সাক্ষাৎ হলে ভেবে দেখব তোমার সাথে কী আচরণ করা যায়। কিন্তু যাহোক, এখন তোমার জন্য নির্দেশ এটাই যে, তুমি হুযায়ফার কাছে গিয়ে তার সাহায্য কর, তার সাথে যুক্ত হয়ে তাকে যে অভিযান সম্পন্ন করার জন্য পাঠানো হয়েছে সেক্ষেত্রে তার সহযোগিতা কর। তার যদি তোমাদের সাহায্যের প্রয়োজন না পড়ে তাহলে তুমি ইয়েমেন এবং হাযার মওতে চলে যেও এবং সেখানে মুহাজের বিন উমাইয়্যার সাহায্য কোরো। হযরত আবু বকর (রা.) মুহাজের বিন উমাইয়্যাকে কিন্দা গোত্রের মুকাবিলা করার জন্য হাযার মওত পাঠিয়েছিলেন। হযরত আবু বকর (রা.) হযরত শারাহ্‌বীলকে পরবর্তী নির্দেশনা পাওয়া পর্যন্ত সেখানেই অবস্থান করার নির্দেশ প্রদান করেন। এরপর হযরত খালেদ বিন ওয়ালীদ (রা.)-কে ইয়ামামায় পাঠানোর পূর্বে হযরত শারাহ্‌বীলকে লিখে পাঠান যে, খালেদ যখন তোমার কাছে আসবেন এবং ইয়ামামায় তোমার কাজ সম্পন্ন হয়ে যাবে তখন তুমি কুযাআ অভিমুখে যাত্রা করবে এবং হযরত আমর বিন আস (রা.)-এর সাথে যুক্ত হয়ে কুযাআর সেসব বিদ্রোহীকে শায়েস্তা করবে যারা ইসলাম গ্রহণে অস্বীকৃতি জানাবে এবং ইসলামের বিরোধিতায় বদ্ধ পরিকর থাকবে। শুধু অস্বীকারই নয় বরং বিরোধিতাও এর অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। হযরত শারাহ্‌বীলও হযরত আবু বকর (রা.)-এর নির্দেশনার বিপরীতে হযরত ইকরামার মতো ত্বরাপরায়ণতার পরিচয় দিয়ে তার কাছে হযরত খালেদ (রা.)-এর আগমনের পূর্বেই মুসায়লামার সাথে যুদ্ধ আরম্ভ করে দেন, কিন্তু তিনিও পরাজয়ের সম্মুখীন হন। এতে হযরত খালেদ (রা.) তার প্রতি অসন্তুষ্টির বহিঃপ্রকাশ করেন। হযরত আবু বকর (রা.) হযরত খালেদ (রা.)-এর সাহায্যের জন্য হযরত সালীদের নেতৃত্বে বর্ধিত সাহায্যকারী বাহিনীও প্রেরণ করেন যেন তারা সেনাবাহিনীর পশ্চাৎভাগকে সুরক্ষিত রাখতে পারেন। হযরত আবু বকর (রা.) হযরত খালেদ (রা.)-কে মুসায়লামার দিকে প্রেরণ করেন এবং তার সাথে মিলিত হয়ে যুদ্ধ করার জন্য মুহাজের ও আনসারদের একটি বাহিনী প্রেরণ করেন। হযরত আবু বকর (রা.) হযরত সাবেত বিন কায়েসকে আনসারদের আমীর এবং হযরত আবু হুযায়ফা ও যায়েদ বিন খাত্তাবকে মুহাজেরদের আমীর নিযুক্ত করেন। অনুরূপভাবে যত গোত্র ছিল প্রত্যেক গোত্রের জন্য একেকজনকে তত্ত্বাবধায়ক নিযুক্ত করেন। হযরত খালেদ বুতাহ্ নামক স্থানে এই বাহিনীর আগমনের অপেক্ষা করছিলেন। বুতাহ্ হলো, বনী যয়ীম গোত্রের একটি জায়গা। যাহোক এরা সবাই যখন হযরত খালেদের কাছে পৌঁছে যায় তখন তিনি ইয়ামামার উদ্দেশ্যে যাত্রা আরম্ভ করেন। বনু হানীফার লোকসংখ্যা সেদিন অনেক বেশি ছিল। তাদের বাহিনী ছিল চল্লিশ হাজার যোদ্ধা সম্বলিত। ইয়ামামার এই দল, যারা

মুসায়লামার সাথে ছিল, তাদের সংখ্যা চল্লিশ হাজার ছিল। অপর একটি রেওয়ায়েত অনুযায়ী তাদের সংখ্যা এক লক্ষ বা তারও অধিক ছিল। এর বিপরীতে মুসলমানদের সংখ্যা ছিল দশ হাজারের কিছু বেশি। যাহোক, সেখানে যখন বড়সড় যুদ্ধ আরম্ভ হওয়ার পূর্বেই মুসলমানরা বনু হানীফার এক নেতাকে গ্রেফতার করে ফেলে। যেমন এক রেওয়ায়েতে বর্ণিত হয়েছে যে, মুজাআ বিন মুরারা, যে বনু হানীফা গোত্রের অন্যতম নেতা ছিল, সে যখন একটি দলের সাথে বাইরে বের হয় তখন মুসলামানরা তার সঙ্গীসাথিসহ তাকে আটক করে ফেলে। হযরত খালেদ তার সঙ্গীদের হত্যা করেন এবং মুজাআ-কে জীবিত রাখেন, কেননা বনু হানীফা গোত্রে তার অনেক সম্মান ছিল। এই ঘটনার বিস্তারিত বিবরণ হলো, হযরত খালেদ যখন আরিয নামক স্থানে পৌঁছেন তখন দুই শত অশ্বারোহী অগ্রে প্রেরণ করেন এবং বলেন যাদেরকেই পাও বন্দি করবে। সেই অশ্বারোহীদের দল যাত্রা করে, এমনকি তারা মুজাআ বিন মুরারা হানাফীকে তার তেইশ জন সমগোত্রীয় লোকের সাথে বন্দি করে ফেলে, যারা বনু নুমায়ের গোত্রের এক ব্যক্তির সন্ধানে বেরিয়েছিল। তারা বাইরে বেরিয়েছিল এবং হযরত খালেদের আগমনের কথা তারা জানত না। মুসলমানরা তাদেরকে জিজ্ঞাসা করে, তোমরা কারা? তারা উত্তরে বলে, আমরা বনু হানীফা গোত্রের সদস্য। মুসলমানরা মনে করে তারা হযরত খালেদের উদ্দেশ্যে প্রেরিত মুসায়লামার গুপ্তচর। সকালে যখন লোকেরা মুখোমুখি হয় তখন মুসলমানরা তাদের ধরে এনে হযরত খালেদের নিকট উপস্থিত করে। হযরত খালেদ নিজেও তাদেরকে দেখে মনে করেন, এরা হয়ত মুসায়লামার গুপ্তচর। তিনি (রা.) তাদের জিজ্ঞেস করেন, হে বনু হানীফাবাসী! তোমাদের নেতা অর্থাৎ মুসায়লামার বিষয়ে তোমাদের কী অভিমত? তারা সাক্ষ্য দেয় যে, সে আল্লাহ্‌র রসূল। হযরত খালেদ মুজাআ-কে জিজ্ঞেস করেন, তোমার কী অভিমত? সে বলে, খোদার কসম! আমি কেবলমাত্র বনু নুমায়ের গোত্রের এক সদস্যের সন্ধানে বেরিয়েছিলাম যে-কিনা আমাদের গোত্রে হত্যাকাণ্ড ঘটিয়েছে আর আমি মুসায়লামার নৈকট্যভাজন কেউ নই। যাহোক, সেই মুহূর্তে সে প্রাণভয়ে হোক আর যেকারণেই হোক না কেন, নিজের কথা থেকে সরে যায় আর বলে আমি রসুলুল্লাহ্ (সা.)-এর নিকট উপস্থিত হয়ে ইসলাম গ্রহণ করেছিলাম এবং এখনও আমি মুসলমানই আছি। (তার গোত্রের) অন্যদেরও নিয়ে আসা হয় এবং হযরত খালেদ তাদের সবার মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করেন। অবশেষে যখন সারিয়া বিন মুসায়লামা বিন আমেরের পালা আসে, সে বলে, হে খালেদ! তুমি যদি ইয়ামামাবাসীদের কোন ভালো বা মন্দ চাও তাহলে মুজাআ-কে জীবিত রাখ। সে যুদ্ধ ও শান্তি উভয় অবস্থাতে তোমার সাহায্যকারী হবে এবং সে একজন নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি ছিল। এজন্য তিনি (রা.) তাকে হত্যা করান নি। সারিয়ার এ কথা তার (রা.) পছন্দ হয়। তাই তিনি তাকেও জীবিত রাখেন এবং তাদের দুজনকে লোহার শিকল দিয়ে বাঁধার আদেশ দেন। তিনি মুজাআ-এর লোহার শিকলে শিকলাবদ্ধ অবস্থাতেই তাকে ডেকে কথা বলতেন। মুজাআ' মনে করত তাকে হযরত খালেদ হত্যা করবেন। তাদের কথোপকথনের মাঝে মুজাআ বলে বসে, হে ইবনে মুগীরাহ্! (এটি খালেদ বিন ওয়ালীদের ডাক নাম ছিল), আমি মুসলমান। আল্লাহ্‌র কসম! আমি কোন কুফরী করি নি, আমি রসূলে করীম (সা.)-এর সকাশে উপস্থিত হয়ে তাঁর নিকট থেকে ইসলাম গ্রহণ করে এসেছিলাম আর এখনও আমি যুদ্ধের উদ্দেশ্যে বের হই নি। এরপর সে নুমায়েরাকে সন্ধান করার কথা পুনরাবৃত্তি করে। হযরত খালেদ বলেন, হত্যা করা আর মুক্ত করে দেয়ার মাঝে কিছুটা দূরত্ব আছে। অর্থাৎ বন্দি করে রাখা, যতদিন না আল্লাহ্ আমাদের যুদ্ধের বিষয়ে কোন সিদ্ধান্ত প্রদান করেন।

আর তিনি তা অচিরেই করবেন। তিনি (রা.) তার স্ত্রীর অধীনে তাকে হস্তান্তর করেন যাকে তিনি (রা.) মালেক বিন নুয়ায়রা'র হত্যার পর বিয়ে করেছিলেন। তিনি (রা.) তার স্ত্রীকে আদেশ দেন যেন বন্দি অবস্থায় তার প্রতি ভালোভাবে খেয়াল রাখা হয়। মুজাআ মনে করে, খালেদ তার কাছ থেকে শত্রুদের অবস্থান জানার জন্য বন্দি করে রেখেছেন। সে বলে, আপনি জানেন আমি রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর নিকট উপস্থিত হয়েছিলাম এবং তাঁর হাতে ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হয়েছিলাম? সে বারংবার এ কথারই পুনরাবৃত্তি করছিল। এরপর আমি নিজ জাতিতে ফিরে যাই এবং আজও আমার অবস্থা তা-ই আছে যা গতকাল ছিল। কিন্তু পরবর্তীতে যেসব ঘটনা সংঘটিত হয়, সেগুলো থেকে বুঝা যায় যে, এগুলো তার মিথ্যাচার ছিল। মুজাআ'র দলের বিষয়টি নিস্পত্তি করে হযরত খালেদ ইয়ামামা অভিমুখে অগ্রসর হন। তার আগমনের সংবাদ পেয়ে মুসায়লামা নিজ গোত্র বনু হানীফাকে নিয়ে মোকাবিলার জন্য বের হয় এবং আকরাবায় গিয়ে শিবির স্থাপন করে। এই স্থানটিও ইয়ামামার সীমান্তে ইয়ামামার ক্ষেত-খামার ও সবুজ-শ্যামল এলাকার সামনে অবস্থিত ছিল। খালেদ (রা.) নিশ্ছিদ্র পরিকল্পনার উদ্যোগ নেন। তিনি শত্রুকে কখনো দুর্বল মনে করতেন না। যুদ্ধক্ষেত্রে সর্বদা পূর্ণ প্রস্তুতি ও পরিপূর্ণ সতর্কতার সাথে থাকতেন, যেন পাছে শত্রু অকস্মাৎ আক্রমণ না করে বসে বা কোন ষড়যন্ত্র না করতে পারে। তার সম্পর্কে এই বৈশিষ্ট্য বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি নিজে ঘুমোতেন না, কিন্তু অন্যদের ঘুমোনোর সুযোগ দিতেন; নিজে পূর্ণ প্রস্তুতি গ্রহণ করে রাত পার করতেন। শত্রুপক্ষের কোন বিষয়ই তার কাছে গোপন থাকত না। সৈন্যদল সুবিন্যস্ত করার সময় ঘনিয়ে এসেছিল। এই যুদ্ধে পতাকাবাহক ছিলেন হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন হাফস বিন গানেম, এরপর তা হযরত আবু হুযায়ফার মুক্তকৃত ক্রীতদাস হযরত সালেমের হাতে অর্পিত হয়। হযরত খালেদ এই যুদ্ধে হযরত শারাহ্বীল বিন হাসানাকে অগ্রে প্রেরণ করেন আর মুসলিম সৈন্যদলকে পাঁচ ভাগে বিভক্ত করেন। সম্মুখভাগে হযরত খালেদ মাখযূমী, ডানদিকে হযরত আবু হুযায়ফা, বামদিকে হযরত শুজাআ', মধ্যভাগে হযরত যায়েদ বিন খাত্তাব এবং অশ্বারোহী বাহিনীর নেতৃত্বে হযরত উসামা বিন যায়েদকে নিযুক্ত করেন। আর উটগুলোকে তিনি বাহিনীর পেছনে রাখেন, যেগুলোর ওপর তাঁবু চাপানো ছিল এবং মহিলারা তাতে আরোহিত ছিল। এই বিন্যাস ছিল যুদ্ধের পূর্বের সর্বশেষ বিন্যাস। অন্যদিকে মুসায়লামা কায্যাবের বাহিনীও প্রস্তুত হয়ে দাঁড়িয়ে ছিল এবং মুসায়লামার পুত্র শারাহ্বীল নিজ গোত্রের উদ্দেশ্যে বলে, হে বনু হানীফা! আজ আত্মাভিমান প্রদর্শনের দিন! আজ যদি তোমরা পরাজিত হও তাহলে তোমাদের নারীদের দাসী বানানো হবে এবং বিবাহ ছাড়াই তাদেরকে ব্যবহার করা হবে। তাই আজ তোমরা নিজেদের সম্মান-সম্ভ্রমের সুরক্ষায় পূর্ণ বীরত্ব প্রদর্শন কর এবং নিজেদের নারীদের সুরক্ষা বিধান কর। যাহোক, এরপর তুমুল যুদ্ধ হয়। এই যুদ্ধ এত কঠিন ছিল যে, মুসলমানদের এর পূর্বে কখনো এরূপ যুদ্ধের সম্মুখীন হতে হয় নি। মুসলমানরা পিছু হটতে বাধ্য হয়; (এখানেও পিছু হটতে হয়েছিল) এবং বনু হানীফার লোকেরা মুজাআ'কে মুক্ত করার জন্য অগ্রসর হয় ও হযরত খালেদের তাঁবুতে হামলার সংকল্প করে। হযরত খালেদ ততক্ষণে তাঁবু হতে বেরিয়ে গিয়েছিলেন, তাই তারা মুজাআ' পর্যন্ত পৌঁছে যায়, যে কিনা হযরত খালেদের স্ত্রীর তত্ত্বাবধানে ছিল। মুরতাদরা তার স্ত্রীকে হত্যা করতে চায়, কিন্তু মুজাআ' তাদের বাধা দেয় এবং বলে, একে আমি নিরাপত্তা দিচ্ছি। তাই তারা তাকে ছেড়ে দেয়। মুজাআ' বলে, তোমরা পুরুষদের ওপর আক্রমণ কর। (একদিকে সে এই দাবি করত যে, আমি মুসলমান; অপরদিকে বিরুদ্ধবাদীদের বলছে, তোমরা পুরুষদের ওপর আক্রমণ

কর।) এরপর তারা তাঁবু কেটে ফেলে। মুসলিম বাহিনী পিছু হটলেও হযরত খালেদ বিন ওয়ালীদের দৃঢ়সংকল্প, অবিচলতা, সাহস ও দৃঢ়চিত্ততায় বিন্দুমাত্রও ভাটা পড়ে নি এবং এক মুহূর্তের জন্যও তিনি মনে করেন নি যে, পরাজিত হবেন। হযরত খালেদ উচ্চস্বরে নিজ বাহিনীকে ডেকে বলেন, হে মুসলমানেরা! পৃথক পৃথক হয়ে যাও; (অর্থাৎ প্রত্যেক গোত্র যেন আলাদা আলাদাভাবে জোটবদ্ধ হয়ে যুদ্ধ করে) এবং এই অবস্থাতেই শত্রুর সাথে লড়াই কর যেন আমরা দেখতে পাই যে, কোন্ গোত্র যুদ্ধে সবচেয়ে বেশি বীরত্ব প্রদর্শন করেছে। এই ঘোষণার অর্থ ছিল, প্রত্যেক মুসলমান যেন স্ব-স্ব গোত্রের পতাকাতলে যুদ্ধ করে। এর মাধ্যমে তিনি সকল গোত্রের মাঝে যেন এক নতুন প্রাণ সঞ্চার করেন এবং তাদের মাঝে নিজেদের স্বাতন্ত্র্য ও বীরত্ব প্রমাণ করার জন্য এক প্রতিযোগিতার স্পৃহা সৃষ্টি করেন। মুসলমানরাও একে অপরকে অনুপ্রাণিত করে। এর বিস্তারিত বিবরণ সম্পর্কে জানা যায় যে, হযরত সাবেত বিন কায়েস বলেন, হে মুসলানেরা! কতই না মন্দ সেই বিষয় যাতে তোমরা অভ্যস্ত হয়ে পড়েছ! (অর্থাৎ, যদি আরামপ্রিয়তায় অভ্যস্ত হয়ে গিয়ে থাক তবে তা খুবই মন্দ কথা।) সাহাবীরা একে অপরকে যুদ্ধের জন্য অনুপ্রাণিত করতে থাকে এবং বলতে থাকে, হে সূরা বাকারার অধিকারীরা, আজ মায়াজাল কেটে গেছে। হযরত সাবেত বিন কায়েস হাঁটু সমান মাটিতে গর্ত করে নিজেকে তাতে প্রোথিত করেন। তিনি আনসারদের পতাকা বহন করছিলেন। এছাড়া তিনি 'হনুত' বা লোবান মেখে নিয়েছিলেন। আরবে এই রীতি ছিল যে, যারা নিজেদের বীরত্ব প্রদর্শন করতে চাইতো তারা এমন করতো, তারা এটি প্রকাশ করতে চাইতো যে, মৃত্যুর পর মানুষের আমার সাথে যা করার কথা ছিল তা আমি নিজেই নিজের সাথে করে নিয়েছি। নিজেকে অর্ধেক মাটিতে পুঁতে নিয়েছি; অর্থাৎ আমি মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত। আর 'হনুত' ছিল কয়েকটি সুগন্ধীযুক্ত জিনিসের এক মিশ্রণ, যা লাশকে গোসল করানোর পর তার শরীরে লাগানো হয়। অথবা সেসব ঔষধ যা শবদেহে লাগালে দীর্ঘ সময় তা পঁচন থেকে সুরক্ষিত থাকে। যাহোক, রেওয়ায়েতে বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি কাফন বেঁধে নেন আর শত্রুদের মোকাবিলায় অবিচল থাকেন। অবশেষে তিনি শাহাদাতের পেয়ালা পান করেন।

এর বিবরণ আরও বাকি আছে, যা ইনশাআল্লাহ্ আগামীতে উপস্থাপন করা হবে।

এখন আমি কয়েকজন প্রয়াত ব্যক্তির স্মৃতিচারণ করতে চাই। সর্বপ্রথম এক শহীদের স্মৃতিচারণ করা হবে যাকে সম্প্রতি শহীদ করা হয়েছে। তিনি হচ্ছেন, উকাড়ার এল-প্লট জামা'তের প্রেসিডেন্ট মাস্টার মুনাওয়ার আহমদ সাহেবের পুত্র জনাব আব্দুস সালাম সাহেব। তাকে ১৭ মে তারিখে শহীদ করা হয়েছে। তার বয়স ছিল ৩৫ বছর। আহমদীবিরোধী এক ব্যক্তি ছুরিকাঘাতে তাকে শহীদ করেছে, إِنَّا لِلّٰهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ। ঘটনার বিস্তারিত বিবরণ অনুসারে আব্দুস সালাম সাহেব নিজের দুই শিশু সন্তান স্নেহের ক্বমরুস সালাম যার বয়স ছয় বছর ও স্নেহের বদরুস সালাম যার বয়স সাড়ে চার বছর, তাদেরকে সাথে নিয়ে কোন কাজে বাড়ি থেকে বের হয়েছিলেন, বরং তাকে ডাকা হয়েছিল যে, তোমাদের ঘরের পানির সংযোগ ঠিক করিয়ে নাও। আর মনে হচ্ছে এটিও তাদের কোন পরিকল্পনা ছিল। পূর্বপরিকল্পিতভাবে তাকে বাড়ি থেকে বাহিরে ডেকে আনা হয় আর শত্রু পিছন থেকে তার ওপর আক্রমণ করে। যাহোক তিনি যখন বাড়ি থেকে বের হন তখন হাফেয আলী রেযা ওরফে মুলাযেম হোসেন নামের এক আহমদীবিরোধী তার পিছু নেয় আর তার ওপর খঞ্জরের হামলা করে। তখন ছিল সন্ধ্যা বেলা। আক্রমণের ফলে আব্দুস সালাম সাহেব আঘাতের তীব্রতা সহ্য করতে না পেরে নিজের নিষ্পাপ দুই শিশু সন্তানের সামনে ঘটনাস্থলেই শহীদ হন। (আক্রমণকারী) প্রথমে

পিছন থেকে তার ওপর আক্রমণ করে, তার বৃক্ক কেটে ফেলে, এরপর তার পেটের নাড়িভুঁড়িতে আঘাত করে, অতঃপর তার হৃৎপিণ্ডে আঘাত করে। যাহোক, তিনি ঘটনাস্থলে সন্তানদের সামনেই শহীদ হয়ে যান আর সেই অপরাধী ঘটনাস্থল থেকে পালিয়ে যায়। এই হত্যাকারীরা যারা জান্নাতের লোভে আহমদীদেরকে শহীদ করে, (এ ব্যক্তি) উকাড়া জেলার এল প্লটে অবস্থিত স্থানীয় মাদ্রাসা জামেয়া আমিনিয়া ফরিদিয়া-র একজন ছাত্র। আর ঘটনার দুদিন পূর্বেই মাদ্রাসা থেকে হিফ্য কোর্স সম্পন্ন করে বের হয়। মাদ্রাসার সমাবর্তন অনুষ্ঠানে মাদ্রাসার ব্যবস্থাপক মৌলবি তার বক্তৃতায় সদ্য পাশ করা ছাত্রদের বলেছিল যে, আহমদীয়া জামা'তের বিরুদ্ধে তোমাদের ব্যবস্থা নেয়া উচিত আর খুব উত্তেজিত করে এবং সবচেয়ে ভয়াবহ পদক্ষেপ গ্রহণেরও আহ্বান জানায়। যাহোক এরা যেভাবে মানুষকে জান্নাতে নিয়ে যেতে চায় সেই পন্থা অনুসরণে তারা নিজেরাও জাহান্নামের পথ খুঁজছে আর মানুষকেও জাহান্নামের পথে পরিচালিত করছে। শহীদ মরহুমের পরিবারে আহমদীয়াতের সূচনা তার প্রপিতামহ হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর সাহাবী হযরত নবী বখ্শ সাহেবের মাধ্যমে হয়েছিল, যিনি হুশিয়ারপুর জেলার অন্তর্গত ফামিয়া নিবাসী ছিলেন। শহীদের দাদা মুকাররম মুহাম্মদ সিদ্দীক সাহেব জন্মগত আহমদী ছিলেন। পাকিস্তান গঠিত হওয়ার পর তারা উকাড়ায় স্থানান্তরিত হন। শহীদ মরহুম মাধ্যমিক তথা মেট্রিক পর্যন্ত পড়াশোনা করেছেন, এরপর থেকে কৃষিকাজ করছিলেন। তিনি ওয়াকফে নও-এর আশিসময় স্কীমের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। তার মায়ের বর্ণনা রয়েছে যে, তিনি যখন তাকে বলতেন, তুমিও ওয়াক্ফে নও, তোমার দুই ভাই মুরব্বী হয়ে গেছে অথচ তুমি হতে পারলে না, তখন তিনি উত্তরে বলতেন, আমি তাদের সেবা করছি। আল্লাহ্ তা'লা আমার এই সেবাকে কিছুটা হলেও গ্রহণ করবেন আর আমি যে কাজ করছি পুরো পরিবারের জন্য বা ঘরের সদস্যদের জন্য, কেননা তিনি কৃষিকাজ করে এবং নিজের অন্যান্য কাজের মাধ্যমে পুরো পরিবারের ব্যয়ভার বহন করেছেন, আর্থিকভাবে তিনি সবাইকে নিশ্চিন্ত রেখেছিলেন। ঘটনার সময়ও তিনি খোদ্দামুল আহমদীয়ার কায়েদ হিসেবে সেবা করার সুযোগ পাচ্ছিলেন আর আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় ওসীয়্যত ব্যবস্থাপনায়ও অন্তর্ভুক্ত ছিলেন (তথা ওসিয়্যতকারী ছিলেন)। খুবই মিশুক এবং সবার প্রতি আন্তরিক ছিলেন। যার সাথেই সাক্ষাৎ হতো, তাকেই আপন করে নিতেন। তার পরিচিত অ-আহমদীরাও একই কথা বলছিল যে, তার সাথে ভয়াবহ অন্যায় করা হয়েছে, কিন্তু উগ্রবাদী মোল্লার সামনে একথা বলার সাহস তাদের কারো নেই। পাকিস্তানে ভদ্রতার বাকরোধ করে দেয়া হয়েছে। যাহোক, মরহুম সম্পর্কে তার ভাই ও আত্মীয়-স্বজনদের বিবৃতি হলো, খিলাফতের সাথে তাঁর অকৃত্রিম ভালোবাসার সম্পর্ক ছিল। বৈষম্যহীনভাবে অভাবী আহমদী এবং অ-আহমদীদেরকে নীরবে-নিভৃতে সাহায্য করতেন। আতিথেয়তা ছিল তার লক্ষ্যণীয় বৈশিষ্ট্য। বিশেষভাবে কেন্দ্রীয় অতিথিদের সেবায় অগ্রগামী থাকতেন। তার আত্মীয়-স্বজন সবাই লিখেছেন যে, তিনি এক নির্ভীক এবং সাহসী যুবক হিসেবে পরিচিত ছিলেন। অতীতেও বিরোধীদের পক্ষ থেকে শহীদ মরহুমকে দুই ঈদেই সহিংসতার লক্ষ্যে পরিণত করা হয়েছে, কিন্তু আল্লাহ্ তা'লা তাকে সেসময় রক্ষা করেছেন, তবে এবারের ঘটনা ছিল ভাগ্যের লিখন।

শহীদ মরহুম নিজের অবর্তমানে পিতা মোকাররম মাস্টার মুনাওয়ার আহমদ সাহেব, ওকাড়ার এল-প্লট জামা'তের প্রেসিডেন্ট এবং মা শমশাদ কাওসার সাহেবা ছাড়াও তার সহধর্মিণী ফারজানা ইরাম এবং তিনজন ছোট শিশুসন্তান যথাক্রমে ছয় বছর বয়স্ক ক্বমর ইসলাম, সাড়ে চার বছর বয়স্ক বদর ইসলাম এবং কন্যা স্নেহের সেহেরকে রেখে গেছেন যার

বয়স ১ বছর ৬ মাস। শহীদ মরহুমের চার ভাই রয়েছেন যাদের মাঝে একজন হলেন রিসার্চ সেলে কর্মরত মুরব্বী সিলসিলাহ্ জনাব যহুর ইলাহী তৌকির সাহেব। আরেক ভাই হলেন মুরব্বী সিলসিলাহ্ হাফিয আনোয়ার সাহেব। তিনিও পাকিস্তানে কর্মরত আছেন। এছাড়া আরও দু'ভাই আছেন যাদের একজন লন্ডনের অধিবাসী এবং অন্যজন আছেন রাবওয়াতে। তার বোন তিনজন, যাদের মাঝে একজন যুক্তরাজ্যের ম্যানচেস্টারের অধিবাসী। তিনি যিশান খালেদ সাহেবের সহধর্মিণী। আরেকজন কুয়েতে আছেন। তৃতীয় জনও লন্ডনে থাকেন। আল্লাহ্ তা'লা শহীদ মরহুমের পদমর্যাদা উন্নীত করুন এবং জান্নাতুল ফেরদৌসে উচ্চস্থান দান করুন। শহীদের নিষ্পাপ শিশু, সহধর্মিণী এবং পিতামাতা ও সকল আত্মীয়স্বজনের স্বয়ং আল্লাহ্ তা'লা সাহায্য ও তত্ত্বাবধান করুন। নিষ্পাপ শিশু সন্তানদের সামনে তাদের পিতাকে (নৃশংসভাবে) শহীদ করা হয়েছে, তাদের হৃদয়ের যে কী অবস্থা হবে আর কী অনুভূতি- তা আল্লাহ্ই ভালো জানেন। শহীদের ৬ বছরের জ্যেষ্ঠপুত্র, যে কিছুটা বুঝতে শিখেছে আর তার চোখের সামনেই হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হয়েছে, বলা হচ্ছে সে বর্তমানে একেবারেই বাকরুদ্ধ। আল্লাহ্ তা'লাই তাদেরকে ধৈর্য এবং প্রশান্তি দিতে পারেন আর আল্লাহ্ তা'লাই ঐ শিশু সন্তানদেরও সুরক্ষা করুন এবং শত্রুকে তাদের কর্মের সমুচিত শাস্তি দিন।

দ্বিতীয় স্মৃতিচারণ হবে ফয়সলাবাদের অধিবাসী প্রিয় যুলফিকার আহমদের যিনি শেখ সাঈদুল্লাহ্ সাহেবের সুপুত্র। তিনি সম্প্রতি ৩৬ বছর বয়সে হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে আযারবাইজানে একটি হোটেলে মৃত্যু বরণ করেন। তিনি আযারবাইজান গিয়েছিলেন, إِنَّا لِلّٰهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ। তাদের বংশে আহমদীয়াতের সূচনা হয় তার প্রপিতামহ হযরত শেখ রহমতুল্লাহ্ সাহেবের মাধ্যমে, যিনি হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর সাহাবী ছিলেন এবং হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর সাহাবী হযরত শেখ ঝাণ্ডা সাহেবের পুত্র ছিলেন। হযরত শেখ রহমতুল্লাহ্ সাহেবের কাদিয়ানে মসজিদে মুবারকের সাথে লাগোয়া মুদি দোকান ছিল আর বয়আতের পর কাদিয়ানের নিকটবর্তী নিজ গ্রাম 'তাওয়াককুল ওয়ালা' থেকে তিনি কাদিয়ান হিজরত করেন।

একবার কেউ খলীফা আউয়াল হযরত মওলানা নূরুদ্দীন সাহেব (রা.)-এর কাছে অভিযোগের স্বরে বলেন যে, মসজিদের সাথে লাগোয়া দোকান থাকা ঠিক না। হযরত মৌলবি সাহেব হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-কে এ বিষয়ে অবগত করলে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন, এরা হলো আসহাবে সুফফা। আর এসব আসহাবে সুফফা-কে আল্লাহ্ তা'লা সকল দিক থেকে স্বাচ্ছন্দ্য দান করেছেন এবং তাদের বংশধরও বৃদ্ধি করেছেন। মরহুম ২০০৫ সালে ম্যানচেস্টার বিশ্ববিদ্যালয় থেকে টেক্সটাইলে বি.এস.সি. ডিগ্রী লাভ করেছিলেন। এরপর পারিবারিক ব্যবসা পরিচালনায় ব্যস্ত হয়ে পড়েন। জাগতিক উন্নতির চরম শিখরে উপনীত হয়েও তিনি পরম বিনয় ও নম্রতার দৃষ্টান্ত ছিলেন। সকল স্তরের মানুষের সাথে তার মেলামেশা ছিল। প্রত্যেকের সাথে অত্যন্ত সম্মান ও মর্যাদাপূর্ণ আচরণ করতেন। তিনি প্রত্যেকের সাথে নিজের ভাই ও বন্ধুর মতো আচরণ করতেন। অধীনস্থদের খুব দেখাশোনা করতেন এবং তাদের সাথে অত্যন্ত সহানুভূতিশীল আচরণ করতেন। দান-সদকার ক্ষেত্রে অত্যন্ত অগ্রগামী ছিলেন। এছাড়া তিনি হাসপাতাল প্রভৃতি দাতব্য কাজেও অংশ নিতেন। জামা'তী চাঁদার প্রতিটি খাতে অংশগ্রহণ করতেন, বরং নিজেই সেক্রেটারী মাল-কে স্মরণ করিয়ে দিতেন যে, আমার চাঁদা নিন এবং প্রতিটি খাত সম্পর্কে অবহিত করুন। হিউম্যানিটি ফার্স্ট-এর কাজে তিনি অনেক অবদান রেখেছেন। মানুষের ঘর-বাড়ি নির্মাণ করে দিয়েছেন।

দরিদ্রদের বিয়েশাদীর খরচ বহন করতেন। কারো সাথে পরিচিত হলে তার কাছ থেকে উত্তম জিনিস শেখার চেষ্টা করতেন এবং নিজের জীবনে তা বাস্তবায়নের চেষ্টা করতেন। রমযান মাসে বিশেষভাবে সৃষ্টিসেবামূলক কাজ করতেন। মরহুম এবং তার পিতামাতা বেলিয-এ একটি মসজিদও নির্মাণ করিয়েছেন। এটি অনেক বড় প্রজেক্ট ছিল এবং আল্লাহ্ তা'লার ফযলে সেখানে খুব সুন্দর একটি মসজিদ নির্মিত হয়েছে। তার নামায সম্পর্কেও লেখা হয়েছে যে, কাজ বাদ দিয়ে তিনি সময় বের করতেন। কুরআন করীম তিলাওয়াত করতেন এবং নিজের জীবনকে নিয়মতান্ত্রিকভাবে সাজিয়ে ছিলেন। মসজিদে যাওয়ার ওপর যখন বিধিনিষেধ আসে তখন তার ঘরে বাজামা'ত নামাযের ব্যবস্থা ছিল। তিনি একবার ভ্রমণের জন্য মালয়েশিয়া গিয়েছিলেন। সেসময় পুলিশ জামা'তের সদস্যদের আটক করে নিয়ে গেলে তিনিও কিছু সময়ের জন্য আল্লাহ্‌র খাতিরে কারাবরণের সৌভাগ্য লাভ করেন। মরহুম তার অবর্তমানে স্ত্রী ও দু'টি সন্তান ছাড়া পিতামাতা, পাঁচ ভাই এবং এক বোন রেখে গেছেন। তার মাতা আসেফা সাঈদ সাহেবা ফয়সালাবাদ জামা'তের লাজনার সদর। আল্লাহ্ তা'লা তাদের সবাইকে ধৈর্য ও দৃঢ়মনোবল দান করুন।

ডাক্তার হামেদ মাহমুদ সাহেব তার সম্পর্কে লিখেন, আহমদীয়াত বিশেষত খিলাফতের সাথে তার গভীর ভালোবাসাপূর্ণ সম্পর্ক ছিল। নিজের সামাজিক, রাজনৈতিক এবং প্রশাসনিক সম্পর্কের মাধ্যমে মানুষের সাহায্য করার চেষ্টা করতেন। আর যাদের সাহায্যের প্রয়োজন হতো উৎসাহ-উদ্দীপনার সাথে তাদের সেবা করা নিজের দায়িত্ব জ্ঞান করতেন। কাউকে কষ্টে নিপতিত দেখে সংগোপনে তাকে সাহায্য করাও দায়িত্ব মনে করতেন। সর্বোচ্চ নীরবতা এবং কোন আত্মপ্রদর্শন ছাড়াই এই কাজ করার চেষ্টা করতেন।

ডাক্তার মাসউদুল হাসান নূরী সাহেব বলেন, যুলফিকার অনেক নেক, মর্যাদাবান এবং নিষ্ঠাবান আহমদী যুবক ছিলেন। তিনি বলেন, তার সাথে আমার পরিচয়ের পর থেকেই আমি তার অসাধারণ গুণাবলী, যোগ্যতা ও দক্ষতা সম্পর্কে ভালোভাবে অবহিত হই। হিউম্যানিটি ফার্স্ট-এর আহ্বানে তিনি প্রতিযোগিতামূলকভাবে আর্থিক কুরবানী করতেন। তার কুরবানীর প্রেরণা এবং দানশীলতার মান অনেক উন্নত ছিল। লাখ লাখ রূপি (অকাতরে) দিয়ে দিতেন। এর পাশাপাশি বিনয় ও নম্রতাও প্রদর্শন করতেন। আল্লাহ্ তা'লা তার সাথে ক্ষমা ও অনুগ্রহের আচরণ করুন। তার পিতামাতা এবং স্ত্রীকেও ধৈর্য ও দৃঢ়মনোবল দান করুন। সন্তানদের সুরক্ষা করুন এবং তার পুণ্যসমূহ অব্যাহত রাখার সামর্থ্য দান করুন।

তৃতীয় স্মৃতিচারণ হলো কানাডার মুকাররম মালেক তাবাসসুম মাক্বসুদ সাহেবের যিনি সম্প্রতি ইন্তেকাল করেছেন, إِنَّا لِلّٰهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ। তার পিতা মালেক মাক্বসুদ আহমদ সাহেব ২৮ মে ২০১০ সালে দারুয্ যিকর লাহোরে সংঘটিত হামলায় শাহাদত বরণ করেছিলেন। তার পিতা মালেক মাক্বসুদ আহমদ শহীদ সাহেবের নানা ভূপাল নিবাসী হযরত মালেক আলী বখশ সাহেব হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর সাহাবী ছিলেন, যিনি হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর শিয়ালকোটের লেকচার শুনে বয়আত করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। মালেক তাবাসসুম মাক্বসুদ সাহেব ১৯৯১সালে জীবন উৎসর্গ করেছিলেন। ২০০৬ সালে তাকে নাযারাত উমুরে আমায় পদায়ন করা হয়। তিনি সেখানে নায়েব নাযের উমুরে আমা হিসেবে সেবা করার তৌফিক পেয়েছেন। এরপর ২০১১সালে তাহরীকে জাদীদ দপ্তরে তাকে আইন উপদেষ্টা হিসেবে নিযুক্ত করা হয়। এরপর ২০১৬ সালে আমার অনুমতিক্রমে শহীদদের পরিবারবর্গের সাথে তিনি কানাডা চলে যান। প্রথমে তিনি যেতে চান নি, কিন্তু আমার

নির্দেশের পর চলে যান। কানাডায়ও তিনি উমুরে আমা এবং জায়েদাদ বিভাগসমূহে সেবা করার পাশাপাশি নাযেম দারুল কাযা হিসেবে সেবা করার সৌভাগ্য লাভ করেন। মরহুম নিয়মিত নামায-রোযায় অভ্যস্ত, নিয়মিত তাহাজ্জুদ আদায়কারী, কুরআন প্রেমী ও খিলাফতের সাথে গভীর সম্পর্ক রাখতেন এবং যুগ খলীফার আহ্বানে সর্বদা সাড়া দিতেন। খুবই পুণ্যবান এবং সহানুভূতিশীল মানুষ ছিলেন। মরহুম তার অবর্তমানে মা এবং স্ত্রী ছাড়াও এক পুত্র এবং তিন কন্যা রেখে গেছেন। তার একমাত্র পুত্র ডাক্তার আতহার আহমদ ওয়াকফে জিন্দেগী এবং তার জামাতা উমর ফারুক সাহেব মুরব্বী সিলসিলাহ্। মরহুম লাহোর জেলার আমীর মালেক তাহের আহমদ সাহেবের ভাগ্নে ছিলেন।

তার কন্যা রাযিয়া তাবাসসুম লিখেন, তবলীগের প্রতি তার বিশেষ অনুরাগ ছিল। এক রাতে তিনি তবলীগ করতে যান। সেখানে দুষ্ট ছেলেরা তার ওপর আক্রমণ করে বসে। সেখান থেকে কোনভাবে বেরিয়ে আসেন, কিন্তু সেই মারধরের একটি ঘুষি তার চোখে লেগেছিল। চোখে আঘাত নিয়েই অনেক কষ্টে তিনি বাড়িতে পৌঁছেন, কিন্তু কাউকে বলেন নি। কয়েক বছর পর চোখে যখন পুনরায় সমস্যা দেখা দেয় তখন ডাক্তারকে দেখালে ডা. বলেন, এটি পুরোনো কোনো আঘাতের ফলে হয়েছে। তখন তিনি বলেন, এভাবে একটি ঘটনা ঘটেছিল। যাহোক এ বিষয়ে তিনি আনন্দিত ছিলেন যে, আমার দৃষ্টিশক্তির দুর্বলতা হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) এর বাণী পৌঁছাতে গিয়ে হয়েছে।

মালেক তাহের আহমদ সাহেব লিখেন, তাবাসসুম মাক্বসুদ সাহেব ছোটবেলা থেকেই পুণ্যকাজের প্রতি আগ্রহ রাখতেন। সাংগঠনিক এবং জামা'তী ব্যবস্থাপনার অধীনে কাজ করতেন। খিলাফতের সাথে গভীর সম্পৃক্ততা ছিল এবং জামা'তের ব্যবস্থাপনার আনুগত্য ছিল তার বৈশিষ্ট্য। অসম্ভব বিনয়ী এবং আল্লাহ্‌র ওপর ভরসাকারী ছিলেন। সন্তানদের অতি উত্তম তরবিয়ত করেছেন এবং খিলাফত ও নিযামে জামা'তের সাথে তাদের দৃঢ় সম্পর্ক প্রতিষ্ঠাকল্পে অনেক পরিশ্রম করেছেন।

নায়েব ওকীলুল মাল-২ হাফেয মুহাম্মদ আকরাম কুরায়শী সাহেব বলেন, আমার তার সাথে দীর্ঘদিনের সম্পর্ক। প্রতিবেশির সম্পর্কও ছিল। অত্যন্ত নিষ্ঠাবান, বিশ্বস্ত, সচেতন, সহানুভূতিশীল, সৃষ্টির সেবার প্রেরণায় সমৃদ্ধ, খিলাফতের প্রেমিক ছিলেন। খোদা তা'লার সত্তায় তার পরিপূর্ণ বিশ্বাস ছিল। একবার আমি দেখেছি, কোন ব্যক্তিকে আল্লাহ্ তা'লার তত্ত্বজ্ঞান সম্পর্কে বুঝাচ্ছিলেন। তখন আমি দেখি যে, খোদা তা'লার ভালোবাসা এবং তাঁর মাহাত্ম্যের স্মরণে তার চোখ অশ্রুসিক্ত ছিল। তিনি আরও লিখেন, তার সহকর্মী আমাকে বলেছে, তিনি আমাকে বলতেন যে, আমার উপদেশ হলো, কে কি করছে এটি দেখো না, কারো কথা শুনবে না। কেবলমাত্র নিজের ঈমানের সুরক্ষা কর। খিলাফতের আঁচল ছাড়বে না। এটি ছাড়া কোথাও নিরাপত্তা নেই। খোদ্দামুল আহমদীয়ার যুগ থেকেই জামা'তের সাথে অত্যন্ত গভীর সম্পর্ক ছিল এবং নিজ ধন-প্রাণ-সময় এবং সম্মানের কুরবানীর ক্ষেত্রে সর্বদা অগ্রগামী ছিলেন। এছাড়া টগবগে যুবক ছিলেন, সদা সোচ্চার-সচেতন ছিলেন। শক্তিশালী, দীর্ঘকায় ক্রীড়াবিদ ছিলেন, আর যত যোগ্যতা ছিল জামা'তের সেবায় ব্যয় করেছেন। ছোট বয়সেই সুপ্রিম কোর্টে প্রেকটিসের লাইসেন্স পেয়েছিলেন। বিভিন্ন ধরনের কাজ সমাধায় তার অসাধারণ অভিজ্ঞতা এবং যোগ্যতা ছিল এবং পৃথিবীময় ভ্রমণও করেছেন। এটি নয় যে, কেবল নিজ জগতেই থাকতেন, বরং সর্বদা বিনয় প্রদর্শন করতেন, কখনো স্বার্থপরতা বা আত্মম্ভরিতা ছিল না।

আল্লাহ্ তা'লা মরহুমের প্রতি ক্ষমা ও কৃপাসুলভ আচরণ করুন এবং তার সন্তানদেরও তার পুণ্য ধরে রাখার তৌফিক দিন।

(সূত্রঃ কেন্দ্রীয় বাংলাডেস্কের তত্ত্বাবধানে অনূদিত)